Belles-Lettre 2023, Vol. 1, pp. 221-227

বাংলা ভাষা আন্দোলনে একুশের চেতনা

পশুপতি মন্ডল

বাংলা ভাষা আন্দোলনে ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী দিন টি বিশ্ব-বাঙালি জাতির মাতৃভাষার প্রতীক হয়ে বেঁচে আছে। একুশ হয়ে উঠেছে বাঙালী জীবনের এক অক্ষয় চেতনার সীমাহীন দিগন্ত। একুশে ফেব্রুয়ারী এমন একটি দিন যার সঙ্গে অন্য দিনের তুলনা করা যায় না। একুশ আজ সংগ্রাম আর শপথের দিন হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটি থেকে বিশ্ব বাঙালির হৃদয়ে তরঙ্গ বয়ে যায়। মুক্তি যুদ্ধের সংগ্রামী চেতনার দিন হিসাবেই স্বাধীন বাংলাদেশে উদ্‌যাপিত হয় একুশে ফেব্রুয়ারী। বাংলা দেশের প্রখ্যাত কবি সুফিয়া কামালের ‘এমন আশ্চর্য দিন' নামক কবিতায় তারই এক জীবন্ত চিত্র -

আশ্চর্য এমন দিন। মৃত্যুতে করেনা কেহ শোক,
মৃত্যুরে করে না ভয়, শঙ্কাহীন, কিসের আলোক
উদ্‌ভাসিত করে তোলে ক্লান্ত দেহ, মুখ, পদক্ষেপঃ
সংকল্পের দ্যুতি তার দৃঢ়তার প্রচার প্রলেপ,
করেছে ভাস্বর।

'একুশে ফেব্রুয়ারী' বাংলা ভাষা আন্দোলনের হিমশৈলের চূড়া মাত্র; এর ইতিহাস অনেক গভীরে। বাংলা ভাষা আন্দোলনে একুশে ফেব্রুয়ারীর ঐতিহাসিক 'বিজয় কথা' লিখতে গিয়ে একটি কথা অবশ্যই বলা দরকার যে বাঙালিদের উপর উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কিন্তু পাকিস্তান আমলে হয়নি- সে চেষ্টা হয়েছিল আরও অনেক আগে থেকে। খ্রিষ্টিয় দশম শতাব্দীতে, পাল আমলে, বৌদ্ধ আচার্য্যরা বাংলা ভাষাকে তাদের গুহ্য সাধনার বাহন হিসাবে ব্যবহার করতেন। এরই ফলশ্রুতি বাংলা ভাষায় লেখা আদিতম নিদর্শন 'চর্যাপদ'। সেন যুগেও বাংলাদেশ ছিল বাঙালি ছিল; কিন্তু সাহিত্যের ভাষা ছিল সংস্কৃত। চলমান বাঙালি সংস্কৃতির দুরন্ত -সরণিতে মধ্যযুগে রাজা গণেশ ছাড়া আর সকল শাসকই ছিলেন অবাঙালি। রাজা গণেশ অবশ্য ইসলাম ধর্ম

....

স্টেট এইডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ।

গ্রহন করে পরবর্তীকালে জালালউদ্দিন নামে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। ইসলামিক শাসন ব্যবস্থায়, মুসলমানেরা বাংলা ভাষাকে হিন্দুদের ভাষা বলে মনে করতেন। মুসলমান শাসনের যুগে তাদের ধর্মের ভাষা ছিল আরবী, অফিস-কাছারির ভাষা ছিল ফারসী, আর কথা বলার ভাষা ছিল উর্দু। তাই মাতৃভাষা বাংলাকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বঞ্চনার স্বীকার হতে হয়েছে- ঐতিহাসিক শাসকের শ্যেন দৃষ্টিতে। তবুও পূর্ব দিগন্তে অত্যন্ত সন্তর্পনে ধীরে ধীরে চেতনার সূর্য জাগ্রত হল সপ্তদশ শতাব্দীর কবি রামনিধি গুপ্তের গানে-

নানান দেশের নানান ভাষা
বিনা স্বদেশীয় ভাষা, পুরে কি আশা?
কত নদী সরোবর, কি বল চাতকীর
ধারা জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা?

মনের ভাষার সর্বাঙ্গীন বহিঃপ্রকাশে মাতৃভাষার অপরিসীম গুরুত্বের কথা স্বীকার করে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত লিখলেন-

হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন
তা সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পর-ধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ,
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি, কুক্ষনে আচরি

সর্বাধুনিক কবি জীবনানন্দ দাশের কথায়

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি-
তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাইনা আর।

সুতরাং, বাংলা ভাষাকে বাঙালীর মুখ থেকে কেড়ে নেওয়ার অপচেষ্টা ১৯৫২ সালের অনেক আগে থেকে শুরু হয়ে, বিষবৃক্ষের সর্বাঙ্গীন রূপ পেয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১৯ শে মে নবগঠিত পূর্বপাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে একটি প্রশাসনিক সভায় মুসলিম লিগ নেতা খালেকুজ্জামান সাহেব ঘোষনা করলেন-

‘উর্দুই হবে নবগঠিত পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা’।

আর পরের ঘটনা ইতিহাসের বর্ণময় মর্মান্তিক চেতনার স্বাক্ষী। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট মধ্যরাতে অখন্ড ভারতের বেশকিছুটা অংশ কেটে নিয়ে গঠিত হল পাকিস্তান

নামক নতুন এক রাষ্ট্র। মুসলিম লিগ নেতা মহম্মদ আলি জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই জন্ম হল দ্বিখন্ডিত ভারতের। খন্ডিত হল অবিভক্ত বাংলা। বাংলার মাটি ভাগ হয়ে গেল। কাঁটাতারে ওপারে এক বাংলা, আর কাটাতারের এপারে আর একটা বাংলা। একই বাঙালির একই ভাষার একই চেতনার উপর নেমে এল প্রশাসনিক আঘাত। মাতৃভাষা বাংলাকে রক্ষা করার দাবিতে সর্ব প্রথম প্রকাশ্য বিক্ষোভ হয় ১৯৪৭ সালের ৫ই ডিসেম্বর সাংবাদিক সভায়। এর পরেই পাকিস্তান সরকার বাংলা ভাষা স্বীকৃতির দাবিদারদের উপর অত্যাচার শুরু করে।

১৯৪৮ সালের ২৫ শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন হয় করাচিতে। উর্দু অথবা ইংরাজী ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষাই বক্তব্য না রাখার অভিমত জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার। কিন্তু, পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত কংগ্রেস দলের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত গণপরিষদের কার্য বিবরণীতে সংশোধনী এনে আবেদন করলেন যে, উর্দু ও ইংরাজীর সঙ্গে বাংলা ভাষাকে যুক্ত করা হোক।" তাঁর বক্তব্যকে জোরালো কণ্ঠে সমর্থন করেছিলেন সংসদ সদস্য, প্রেমহরি বর্মন, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রমুখ ব্যক্তিত্বগণ। কিন্তু স্বৈরতান্ত্রিক শাসক সাংসদ সদস্যদের উত্থাপিত প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন।

আবেদন পর্বের শেষেই শুরু হল প্রতিবাদের ডাক। ১৯৪৮ সালের ২ রা মার্চ ঢাকায় তৈরী “রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। "প্রথম কর্মসূচী ১১ই মার্চ ঢাকায় বাংলা ভাষাকে বাঁচানোর জন্য সর্বাত্মক ধর্মঘট পালিত হল। পশ্চিম পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনও কড়া হাতে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষী মানুষদের চরম দমনপীড়ন, ধর-পাকড় শুরু করলেন। নিষেধাজ্ঞা জারি হল বাংলা ভাষায় প্রকাশিত একাধিক সংবাদপত্রের উপর।

১১ ই মার্চের ধর্মঘট, বাংলাভাষা রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে তথা হাজার হাজার সমর্থকদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের সরকারের পুলিশ বেপরোয়াভাবে লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস ও রাইফেলের ফাঁকা আওয়াজে চরম আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরী করল। আপাত শান্তির প্রস্তাবে ১৫ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজানইমুদ্দিন ও সংগ্রাম পরিষদের মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১৯৪৮ সালের ২৮ শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কার্জন হলে' জিন্নার সম্মেলনে একটি সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মঞ্চে বিভিন্ন বিষয়ে

আলোচনা করার সময় তিনি ঘোষনা করলেন উর্দু-- একমাত্র উর্দুই পাকিস্তানের সরকারী ভাষার মর্যাদা পাবে, অন্য কোনো ভাষা নয়। ঘোষনার সঙ্গে সঙ্গে দর্শক আসন থেকে উঠে আসে চরম প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর "নো নেভার নো নো নো, সেদিনের প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর ছিল'। বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটির ছাত্রনেতা নইমুদ্দিনের প্রতিবাদ গৃহীত হয়নি। সরকার পক্ষে। তবুও আবেদনের রাস্তা থেকে সরেনি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ : ছাত্রদের 'বাংলা ভাষা বাঁচাও' নামক কমিটির সদস্যবৃন্দ, ১৯৪৮ সালের ১৬ই মার্চ থেকে ১৯৫২ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত প্রায় ২৪ মাস বা দুই বছর পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলা দেশের ছাত্রসমাজ চোখের দুই পাতা এক জায়গায় করেননি, অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা তৈরী করে "স্বদেশ বাংলায় বাঙালি জীবনের জনজাগরণের সংগ্রামী ময়দান।

অবশেষে এল ১৯৫২ এর ২১ শে নভেম্বর, অপ্রত্যাশিত ভয়ংকর গণবিপ্লবের তথা বিশ্ববিবেকের শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ। ঐ দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী রাজশাহী সফরে আসেন। প্রধানমন্ত্রীর কাছে বাংলা ভাষা কে সরকারী ভাষায় স্বীকৃতি দানের জন্য ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ডেপুটেশন দিতে চাইলে তা বাতিল করে দেওয়া হয়। ফলে শুরু হয় প্রতিবাদ থেকে প্রতিরোধের আন্দোলন। কিন্তু সরকারের নির্দেশে, পুলিশের সমর্থনে, সরকারী মদতপুষ্ট গুন্ডাবাহিনী ছাত্রসংগ্রাম কমিটির সদস্যদের উপরে অস্ত্র সহ ঝাঁপিয়ে পড়ে। সরকারী পুলিশের সামনেই ছাত্ররা আক্রান্ত হলেন, বেশ কিছু ছাত্র আহত হলেন।

এর পর ২৭ শে নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাবেশে ভাষন দিতে। গিয়ে অন্যান্য নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করলেও পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মুখের ও কাজের জন্য মতবিনিময়ের মাধ্যমে বাংলা ভাষা সম্পর্কে কিছু বলেন নি। প্রধানমন্ত্রী সমাবেশে ভাষন দানের পর, পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যান। ফিরে যাওয়ার পরেই পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা-বিপ্লবী, ভাষা আন্দোলনকারী ছাত্রদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের সরকারের চরম নির্যাতন নেমে আসে। রাজনৈতিক সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক সন্ত্রাসে, একদিকে চরম নিরাপত্তাহীনতা, অন্যদিকে অর্থনৈতিক সংকটের সামনে দাঁড়িয়ে ১৯৫০ সালে শুধুমাত্র জানুয়ারী মাসেই প্রায় ৪২ লক্ষ হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ প্রাণ বাঁচানোর জন্যই পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেন।

গণবিপ্লবের হাতিয়ার হল একদিকে গণআন্দোলন আর অন্যদিকে সরকারি

সমস্ত নিষেধাজ্ঞাকে বয়কট করে সরকারের বিরুদ্ধে জনমত প্রতিষ্ঠা করা। এই আন্দোলনকে প্রকাশ্যে রূপ দিতে অবশেষে বেছে নেওয়া হল ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী দিনটিকে। ঐ অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলার সমস্ত বাঙালি উঠে পড়ে লাগলেন। পাকিস্তান সরকার ঐ দিন ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করল, ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামী ছাত্র-ছাত্রীরা ১৪৪ ধারা অমান্য করার সিদ্ধান্ত নিল। ঐ সময় পূর্বপাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নুরুল আমিন।

২১ শে ফেব্রুয়ারী বহুদিনের পক্ষপাত দুষ্ট স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বাংলার আপামর জনসাধারণের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশের দিন। ঢাকা শহর জুড়ে চরম উত্তেজনা। দিগন্তে সূর্য ওঠার আগেই অনেকটা ভোরেই পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাত্র- ছাত্রীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা প্রান্তে জড়ো হতে লাগলেন। মেডিকেল কলেজ ময়দান, জগন্নাথ হল, রশিদ বিল্ডিং এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সামনে ছাত্রছাত্রীদের চরম ভিড়। পুলিশের হিসাবে প্রায় ত্রিশ হাজার ছাত্রছাত্রী ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্ত্বরে 'বাংলা ভাষা বাঁচাও আন্দোলনে অংশ গ্রহন করেছিল।

পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের নির্দেশে সরকারী পুলিশ সমস্ত বিক্ষোভকারীদের একজায়গায় আটকে রাখার জন্য বিশ্ববিদ্যাপলয়ের কলাভবন ময়দানে তাদের প্রবেশ করতে দিলেও একসঙ্গে দলে দলে প্রতিবাদী ছাত্রছাত্রীদের পুলিশ আর বাইরে আসতে দিল না। তখন ছাত্রনেতারা সিদ্ধান্ত নিলের ৫ জন করে ছাত্র ছাত্রী ব্যানার ফেস্টুন সহ বাইরে বেরিয়ে প্রতিবাদে সামিল হবে। প্রথম দলে রফিকুল ইসলাম, সামসুল হক, জলিল সরকার ও তোহায়ারা ফেস্টুন নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলেন, পরবর্তী দলে, নাদিরা বেগম, সুফিয়া ইব্রাহিম, রওসন আরা পতাকা ফেস্টুন নিয়ে স্লোগান দিতে দিতে বাইরে আসতেই পুলিশি লাঠি চার্জ শুরু হয়। ফাটতে থাকে টিয়ার গ্যাসের সেল, প্রতিরোধে ছাত্ররাও ইট ছুড়তে থাকে। শুরু হয় ছাত্র- পুলিশ খণ্ডযুদ্ধ। অন্যদিকে, 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই', 'ধ্বনিতে, স্লোগান দিতে দিতে ছাত্ররা যখন গণপরিষদ ভবনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে তখন বেলা ৩টে। পুলিশ এলোপাথাড়ি গুলি চালানো শুরু করে, মেডিকেল কলেজের দেওয়াল ভেদ করে গুলি চলে যায় সংগঠিত বিদ্রোহী ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে। মুহূর্তে ঢাকার রাজপথ রক্তে লাল হয়ে ওঠে। পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারালেন- ঢাকার বাবু বাজার এলাকার প্রিন্টিং প্রেসের মালিক আব্দুল লতিফের ছেলে, বাণিজ্য বিভাগের ছাত্র, রফিউদ্দিন আহমেদ। বাংলা ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ।

পুলিশের নির্মম গুলিতে একে একে প্রাণ হারালেন কৃষক পুত্র জব্বার, রাজমিস্ত্রীর একমাত্র সন্তান অহিউল্লাহ। পিটিয়ে মারা হয় ছাত্র নেতা শফিকুল রহমানকে।

২৩ শে ফেব্রুয়ারী বিদ্রোহী ছাত্রদের পাশে এসে দাঁড়ালেন পূর্ব বাংলার আপামর জনসাধারণ। শুরু হল জনতার সঙ্গে পুলিশের খন্ডযুদ্ধ। চলল গুলি। রাস্তায় নামল সেনাবাহিনী। গ্রেপ্তার হলেন অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক পুলিন দে, সতীন সেন, মৌলানা তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন, মৌলানা ভাসানী, আবুল হাসান সহ বিশিষ্ট জনেরা। জেলে বসে কবিতা গান-নাটকে স্বদেশী গণচেতনাকে আগ্নেয় গিরির রূপ দিলেন নাট্যকার মুনীর চৌধুরী। মুনীর চৌধুরীর লেখা নাটক কবর, কিংবা ফজলে খোদা' সমগ্র বাংলা দেশকে অগ্নিগর্ভ করে তুলেছিল। বিদীর্ন হিয়া' অতীতের মর্মান্তিক চিত্রকে বুকে ধরে উপলব্ধি করেছিল সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ, আব্দুল গফ্ফার চৌধুরীর লেখা সেই গানটিকে—

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী,
আমি কি ভুলিতে পারি।
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রুগড়া একুশে ফেব্রুয়ারী,
আমি কি ভুলিতে পারি।।
আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি।।

একুশের ভাষা আন্দোলন, ভাষার দাবিকে সামনে রেখে সংগঠিত হলেও তার মূলে ছিল পূর্ববঙ্গের বাঙালী মুসলমানদের জাতি সত্ত্বাকে বাঁচিয়ে রাখার আন্দোলন। মানুষের মুখ থেকে মাতৃভাষাকে কেড়ে নিলে, শুধুমাত্র তারে মুখের ভাষা স্তব্ধ হয়ে যায় না, তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কেও নির্মূল করে দেওয়া হয়। বাঙালি যেমন বাংলা ভাষায় কথা বলে, তেমনি তার সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলার মধ্যেও আমরা বাংলা ভাষার বাঙ্ময় প্রকাশকে স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখি। তাই একুশ আমাদের বাঙালী জাতির কাছে একদিকে মাতৃভাষার প্রতীক, অন্যদিকে বাঙালী জীবনের জাতিসত্তার চেতনা হয়ে উঠেছে। একুশের ভাষা আন্দোলন বাঙালী সত্তার জাগরনের প্রেরণা- **১৯৭১** সালের স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় উত্থান। একুশের চেতনা রাজনৈতিক কাঁটাতারকে তুচ্ছ করে সমগ্র বাঙালী জাতিকে বিশ্বনন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগীতে মহকালের যাত্রাপথে, গ্রন্থিবদ্ধ করেছে। তাই আমরা দুই বাংলার মানুষ, তথা বিশ্বের সমস্ত বাঙালী

একই সূত্রে গেয়ে উঠি –

‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজাই বাঁশি’।

তথ্য সূত্র:

১) *একুশের কবিতা ও গান* - ডঃ দীপঙ্কর চক্রবর্তী (সম্পাদিত) পিপলস্ বুক সোসাইটি, কলকাতা।

২) *একুশের চেতনা* - কালীপদ দাস, সাহিত্য রত্ন আশীর্বাদ প্রকাশনী, ঢাকা

৩) *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস* - বশীর আলি হেলাল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

৪) *একুশের দলিল* - এম. আর. আখতার মুকুল, অনন্যা প্রকাশ, ঢাকা

৫) *বাংলা ভাষা ও ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন* - মুহম্মদ মতিউর রহমান, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা।